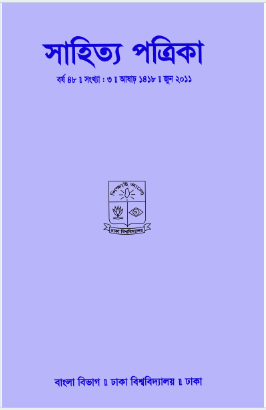

Vol. 48 | No. 3 | 2011

Check for updates

৷# সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পাখোয়াজ বাদনের ঐতিহাসিক পটভূমি

Volume	48
Issue	3
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	তপন কুমার সরকার
Published online	June 1, 2011
DOI	10.62328/sp.v48i3.11
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v48i3.11
Pages	181-198
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

পাখোয়াজ বাদনের ঐতিহাসিক পটভূমি

Check for updates

তপন কুমার সরকার*

সুর ও তাল সংগীতের প্রাণ এবং একটি অপরটির পরিপূরক। সুরের প্রকাশে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই তালের ব্যবহার অনস্বীকার্য। এই তালের উৎকর্ষকে ধারণ বা বহন করে আনদ্ধ (চর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত) বাদ্যযন্ত্র। উচ্চাঙ্গ সংগীতের সুর বা স্বর-সপ্তকের বিকাশে তারবাদ্যযন্ত্র বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। আর আনদ্ধ বা অবনদ্ধ (তালবাদ্য) বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে পরিশীলিত ও প্রচলিত অতি পুরাতন একটি যন্ত্র হলো পাখোয়াজ। সংগীতের উৎপত্তির মতোই পাখোয়াজের পরম্পরা অতি প্রাচীন। আধুনিক কালে এর বাদনক্রিয়া উচ্চাঙ্গ যন্ত্রসংগীতের তবলার সাথে সমান্তরালভাবে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে এটি হয়ে উঠেছে একটি নির্ভরযোগ্য তালবাদ্যযন্ত্র। যদিও ইতিহাসের আলোকে প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত এর যোগসূত্র সূক্ষ্মভাবে আবিষ্কার করা সম্ভব নয়, তথাপি এর উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হয়ে একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায়। এর ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়, যথা : ১. আদিম যুগের অবনদ্ধ বাদ্য; ২. আদি যুগে অবনদ্ধ বাদ্য; ৩. প্রাক্‌বৈদিক যুগে মৃদঙ্গ; ৪. বৈদিক যুগে মৃদঙ্গ; ৫. বেদোত্তর প্রাচীন মৃদঙ্গ; ৬. মধ্যযুগে পাখোয়াজ এবং ৭. আধুনিক যুগে পাখোয়াজ। এই পাখোয়াজ যন্ত্রটির আকৃতি আদিতে কেমন ছিল, এর নাম কী ছিল এবং বর্তমানে তা কোন্ রূপ বা নাম ধারণ করেছে তা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

বিষয়-বিবরণ

পৃথিবীর যে কোনো সংগীতের গোড়ার কথা হলো স্বর ও লয়। স্বর আর লয় আবার নাদ ও কালের গতির পরিবর্তিত রূপ মাত্র। নাদ ও গতির পরিধি অসীম তথা সর্বব্যাপক। পদার্থের ক্ষুদ্রতম রূপ হলো পরমাণু। পরমাণু গঠিত হয় ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদি শক্তিকণা দিয়ে। এরা পরমাণু কেন্দ্রের চতুর্দিকে সদা ঘূর্ণায়মান। এদের সংখ্যা ও গতিবেগের উপরই বস্তুর প্রকৃতি নির্ভরশীল। ফলত একথা বলা চলে যে, বিশ্বনির্মাণের মূলে রয়েছে গতি। 'শব্দ' যা রয়েছে সব সংগীতের মূলে, তার প্রকৃতিও সম্পূর্ণরূপে তরঙ্গের (wave) প্রকৃতি ও গতির ওপর নির্ভরশীল।

বিশ্বপ্রকৃতিতে সুপ্ত 'অনাহত নাদ'কে বল প্রয়োগে 'আহত নাদে' পরিণত করে এবং বিশ্বপ্রকৃতির গতিকে খণ্ড-ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে পাই 'লয়ের' অনুভূতি। আর এই দুয়ের সুসমঞ্জস মিশ্রণেই গড়ে ওঠে সংগীতের সৌধ। আসলে মানবদেহে সুপ্ত রয়েছে নাদ ও গতি। একটি বলিষ্ঠ মানবহৃদয় একটি মেট্রোনোমের মতোই সদা নিয়মিত ক্রিয়াশীল। মানবদেহের মূলাধারে সুপ্ত এই মহানাদ ও লয়কে বহির্জগতে প্রকাশ করার মধ্যে মানবাত্মা

* সিনিয়র ডেমনেস্ট্রেটর, সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করে। তাই সংগীত মানবজীবনে অমূল্য সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে অনাদিকাল থেকে।

গীত, বাদ্য ও নৃত্যের সমাবেশে হয় সংগীত। সংগীতের জগতে 'কণ্ঠসংগীত' সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয়; কারণ এক্ষেত্রে সুমিষ্ট শব্দের সঙ্গে মিশেছে কাব্যের সুষমা। 'কাব্য' শব্দের আবেদনকে ভাবসংযোগে মনোগ্রাহী করে গড়ে তোলে। ফলত মাধুর্য তথা মধুর রসের উদ্ভব হয়। আর নৃত্যের আবেদন সৃষ্টি হয় অভিনয়-কুশলতার মধ্য দিয়ে। কিন্তু যন্ত্র কেবল কাব্য ও অভিনয় বর্জিত শব্দের (sound) ভাষাতেই কথা বলে। তাই শুদ্ধ সংগীত (absolute music) বলতে যন্ত্রসংগীতকেই বোঝানো যেতে পারে। যন্ত্রসংগীত হল স্বয়ংসম্পূর্ণ সংগীত। স্রষ্টা ও শ্রোতার মধ্যে বিমূর্ত ভাবের আদান প্রদানের মধ্যেই এর সার্থকতা। স্বর ও তাল সমন্বয়ে যন্ত্রসংগীত শ্রোতার মন জয় করে নেয়। ওস্তাদ আলী আকবর খানের সরোদের গম্ভীর নাদ, পণ্ডিত রবিশংকরের সেতারের ঝংকার; বিসমিল্লাহ্ খানের সানাই-এর পুকার কিংবা জাকির হোসেনের মনোজ্ঞ তবলা লহরা শুনতে ভালোবাসেন না এমন মানুষ এ দেশে খুব কমই খুঁজে পাওয়া যাবে। শুধু এদেশ কেন দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশের আঙিনায় পৌঁছে গেছে এই মহান কলাকারদের বাজনার আবেদন। যন্ত্রসংগীত স্বয়ংসম্পূর্ণ। এর প্রয়োজন নেই কোনো কাব্য বা অভিনয়ের। শুধু শব্দ মাধ্যমে আপন ভাব ব্যক্ত করতে সক্ষম এই যন্ত্রসংগীত। বিমূর্ত (abstract) রস সৃষ্টিতে চারুকলার জগতে এর জুড়ি মেলা ভার। প্রতীকী প্রকাশনার এ এক পরম নিদর্শন।

নাটকের হাত ধরে সংগীতের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করা সত্ত্বেও যন্ত্রসংগীত আজ আপন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। কণ্ঠসংগীতের কোনো কোনো শাখায় এমনও দেখা যায় যে, কাব্য সংগীতকে পেছনে ফেলে দেয়। অবশ্য শাস্ত্রীয় সংগীতের ক্ষেত্রে কাব্য তথা ভাষার প্রভাব ক্রম-ক্ষীয়মাণ। আর যন্ত্রসংগীতে এসে ভাষা সম্পূর্ণত অবসৃত। এখানে শুধু সুর আর সুর। সঙ্গী শুধু তাল আর লয়। কাব্য আর অভিনয়ের সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে অসীমের পানে এর যাত্রা। কিন্তু যন্ত্র আবার স্বেচ্ছায় কখনও কণ্ঠানুসারী, আবার কখনও নৃত্য তথা অভিনয়ানুসারী। তাই কণ্ঠসংগীত, নৃত্য, নাটক আর আধুনিক ফিল্মের জগতে সুরযন্ত্রের অবাধ প্রবেশাধিকার। গায়ক গান গাইছেন অথচ কোনো সুরযন্ত্র অনুগমন করছে না, নৃত্যশিল্পী নৃত্য করছেন অথচ কোনো সুরযন্ত্র তাঁকে সঙ্গ দিচ্ছে না বা কোনো ছবি (film) বা নাটক প্রদর্শিত হচ্ছে অথচ তাতে নেই কোনো আবহসংগীত — এমনটি ভাবাই যায় না। আসলে কণ্ঠসংগীত-নৃত্য-নাটক-ফিল্মকে গভীরতর ব্যঞ্জনা এনে দিয়ে সার্থক করে তোলে যন্ত্রসংগীত। তাই বলা বাহুল্য যে, 'যন্ত্রসংগীত' সংগীতের জগতে এক অনন্যসাধারণ অবস্থান গ্রহণ করেছে।

ভরত *নাট্যশাস্ত্রে* ২৮ পরিচ্ছেদে 'লক্ষণান্বিতম্ আতোদ্য' (বা পূত সংগীতযন্ত্র) সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। যথা তত (তারযন্ত্র), অবনদ্ধ (চর্মাবৃত যন্ত্র), ঘন (ধাতব বা গভীর শব্দদ্যোতক শক্ত বস্তু করতল জাতীয়), সুষীর (ছিদ্রওয়ালা যা হাওয়ায় বাজে)।[১]

'অবনদ্ধ' সংস্কৃত শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ হলো : রূপ-অব+√নহ্+ক্ত, যার অর্থ হচ্ছে 'বদ্ধ' 'বেষ্টিত' ইত্যাদি। অবনদ্ধ বাদ্যকে 'আনদ্ধ' বাদ্যও বলা হয়। 'আনদ্ধ' সংস্কৃত

শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ— আ + √নহ্ + ক্ত। '√নহ্' ধাতুর অর্থ বেষ্টিত করা বা বন্ধনযুক্ত করা।[২]

প্রাচীন সাংগীতিক পরিভাষায় অবনদ্ধ বা আনদ্ধ জাতীয় বাদ্যযন্ত্রগুলিকে 'বিতত' শ্রেণির বাদ্যও বলা হতো। 'বিতত' নামক সংস্কৃত শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলেও পাই— বি + √তন্ + ক্ত। 'তন্' শব্দের বহু অর্থ আছে, তার মধ্যে একটি হলো 'আচ্ছাদন'। সুতরাং 'বিতত' শব্দের অর্থ এখানে হবে বিশেষভাবে আচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র। বর্তমানে অবনদ্ধ বা আনদ্ধ বা বিতত বাদ্য বলতে বোঝায় চর্মাচ্ছাদিত তালবাদ্য।[৩]

১. আদিম যুগে অবনদ্ধ বাদ্য

সংগীত গবেষকগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন, পৃথিবীর সব দেশের আদিম সংগীতের রূপ ও প্রকৃতি এক এবং অভিন্ন। বিভিন্ন দেশের গহন অরণ্য ও দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে যে সব বর্বর মনুষ্যজাতি বসবাস করে, যারা কাঁচা মাংস খায়, আগুন জ্বালাতে শেখেনি, তাদের নাচ-গান-বাজনার প্রকৃতি দেখে এবং প্রাগৈতিহাসিক মনুষ্য-সমাজে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রাদি পরীক্ষা করে সেই আদিম সংগীত সম্পর্কে গবেষকদের মনে একটা মোটামুটি ধারণা গড়ে উঠেছিল। গবেষকদের সেই ধারণার ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি, আদিম মানুষদের বেঁচে থাকার জন্য পশু শিকার ও যুদ্ধ জয়ের উল্লাস থেকে সর্বপ্রথম জন্ম হয় আদিম নৃত্য বা নাচ।

এই নাচে শৃঙ্খলা আনার জন্য আদিম মানুষেরা গাছের ডাল দিয়ে পাথর খণ্ডের বা শুকনো গাছের গুঁড়িতে ঠুকে ঠুকে শব্দ করে ছন্দ সৃষ্টি করা শিখল এবং সেই শব্দের তালে তালে পা ফেলতে শিখল।

আদিম নাচের পরই তাল ঠোকার জন্য তৈরি হয়েছিল তাল-বাদ্য। ওই শুকনো কাঠের গুঁড়ি ও মসৃণ পাথরের সমতল চাঁই-ই ছিল প্রথম তালবাদ্য যাকে সংগীতের ভাষায় বলে 'ঘন-বাদ্য'। সর্বপ্রথম পাথরের কুঠার দিয়ে গাছের গুঁড়ির কিছুটা পরিমাণ (আনুমানিক দুই বা আড়াই হাত) গর্ত করে পশুর চামড়া দিয়ে এক-মুখ আচ্ছাদন করে অবনদ্ধ বাদ্য সৃষ্টি করা হয়। দেখতে অনেকটা আধুনিক 'কঙ্গো' বাদ্যের মত।[৪] ধীরে ধীরে মানুষ আগুন জ্বালাতে শেখে, জীবজন্তুর মাংস পুড়িয়ে খেতে শেখে এবং তার সাথে সাথে পোড়া মাটির জিনিষপত্র তৈরি করতে শেখে। তখনই পোড়া মাটির এক মুখযুক্ত অবনদ্ধ বাদ্য তৈরি করতে সক্ষম হয়। আদিম মানুষেরা তখন সেই পোড়া মাটির বাদ্যযন্ত্র নাচ গানে বিশেষভাবে ব্যবহারযোগ্য করে তোলে আর এভাবেই ক্রমে ক্রমে মৃদঙ্গের মতো বাদ্যযন্ত্র তৈরি হতে থাকে।

২. আদি যুগে অবনদ্ধ বাদ্য

বিভিন্ন সংগীতশাস্ত্রে উল্লেখ আছে, মহাদেব হচ্ছেন আমাদের সংগীতের প্রথম স্রষ্টা। তাঁর পঞ্চশিষ্য ভরত, নারদ, রম্ভা, হুহু ও তম্বরু মুনিদের তিনি সর্বপ্রথম সংগীত শিক্ষা দেন।

পরবর্তীকালে ভরত পৃথিবীতে সংগীত প্রচার করেন। ভিন্ন মতে ব্রহ্মাকেই সংগীতের আদিগুরু বলা হয়েছে। ব্রহ্মার নিকট থেকে মহাদেব, মহাদেবের নিকট থেকে সরস্বতী এবং সরস্বতী থেকে নারদ ও নারদ থেকে ভরত সংগীত শিক্ষা নেন।[৫] ওপরের মন্তব্য হতে প্রমাণিত হয় যে, ভরতের দ্বারা পৃথিবীতে সংগীতের প্রচার তথা প্রসার ঘটে এবং তিনি মনুষ্য সমাজের প্রথম সংগীত-গুরু। 'শাস্ত্রে কথিত আছে যে, সত্যযুগে মহাদেব ত্রিপুরাসুরকে ঘোর সংগ্রামে বিনাশ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন, এবং সেই সময় ব্রহ্মা মৃদঙ্গের সৃষ্টি করিয়া গজাননকে সমর-বিজয়ী ব্যোমকেশের নৃত্যের সঙ্গে তাল দিবার জন্য অনুমতি করেন, সেই অবধি মৃদঙ্গের উৎপত্তি। পূর্ব্বে মৃদঙ্গ মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মাণ হইত, অর্থাৎ খোল, মর্দ্দল, মৃদঙ্গ এই তিন প্রকার যন্ত্রই একত্র জাতীয়। তাহার পর দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ লীলা সময়ে কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়, অদ্যাপি তাহাই প্রচলিত।'[৬]

অর্থাৎ খোল, মর্দল, মৃদঙ্গ এই তিন প্রকার বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে অনেকের ধারণা যে, মাটির মৃদঙ্গ দ্বাপর যুগে, শ্রীকৃষ্ণের সময় থেকে কাঠের দ্বারা তৈরী হতে থাকে এবং শ্রীকৃষ্ণের রাসনৃত্যের সঙ্গে তা বাজানো হতো; আজও তাই ঐ সময়ের কাঠের তৈরী মৃদঙ্গের সঙ্গে আধুনিক যুগের পাখোয়াজের হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

গীতার ব্যাখ্যাকারেরা পণব শব্দটির অর্থ মৃদঙ্গ বলেছেন। মহাভারতের বিরাট পর্বে 'পনবাদিকাশ্চ তথৈব বাদ্যানি চ বংশশব্দাং' শ্লোকেও পণব নামক বাদ্যটিকে দেখতে পাচ্ছি। বাদ্যটি রণবাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতো। অপর এক পৌরাণিক কাহিনীতে আমরা বানাসুরের নাম পাই। যিনি শিবের বরে হাজার হাত পেয়েছিলেন। তিনি হাজার হাতে মৃদঙ্গ বাজাতেন। এক ভীষণ যুদ্ধে তার সমস্ত হাত কাটা যায়। শিবভক্ত বানাসুর তখন পুনরায় ডম্বরুপাণির সাধনায় মগ্ন হন। তাঁর সাধনায় শিবঠাকুর সন্তুষ্ট হলে তিনি মাত্র দুটি হাত ফিরে পাবার প্রার্থনা করেন এবং বলেন, তিনি কেবল মৃদঙ্গবাদন দ্বারা তাঁর পূজা করার জন্য এই হাত দুটি প্রার্থনা করেছেন। দেবাদিদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে দুটি হাত ফিরে পাবার বর দেন। অসুররাজ দুহাতেই অর্পূব মৃদঙ্গ বাজাতে থাকেন এবং বাজনার মাধ্যমেই তিনি শিবের আরাধনা করতেন।

৩. প্রাকবৈদিক যুগের মৃদঙ্গ

ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সূত্র তথা নির্দেশক হিসাবে বৈদিক যুগকে অগ্রদূত হিসাবে কিছুকাল পূর্বেও গ্রহণ করা হত। ১৯২২ মতান্তরে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রত্নতত্ত্ব ডিরেক্টর স্যার জন মার্শাল দ্বারা 'মহেঞ্জোদারো' এবং সেই সময় দয়ারাম সাহানী কর্তৃক হরপ্পা আবিষ্কৃত হবার ফলে প্রাকবৈদিক যুগের এক নব সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, যা খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ হাজার বছর বা তারও পূর্বে এই ভারতের বুকেই বিরাজ করত। স্যার জন মার্শালের মতে, 'সিন্ধু সভ্যতা কোনো কোনো বিষয়ে সমসাময়িক মিশরীয় বা আসিরীয়-ব্যবিলনীয় সভ্যতা হতে শ্রেষ্ঠতর ছিল।'[৭]

আদিম মানবকে শিকারী, পশুপালক, ও কৃষিজীবী এই তিন ভাগে ভাগ করা হয় । অর্থাৎ মানুষ প্রথমে ছিল ফল -অন্বেষী, পরে হয় শিকারী, তার পর পশুপালক ও কৃষিজীবী।

এরূপ কার্যসূত্রে মানুষের মধ্যে সংগীতের সূচনা হয় বলে পণ্ডিতেরা ধারণা পোষণ করেন। সুর ও তাল সম্বন্ধে চেতনা লাভের পূর্বে আদিম মানুষের মধ্যে পুরুষেরা স্বাভাবিকভাবে ছন্দোবদ্ধ গতিতে এবং মেয়েরা একক সুরে (মেলডি) সংগীতে ভাব প্রকাশ শুরু করে। 'আদিম মানুষেরা সামাজিকভাবে অনুষ্ঠানাদিতে (জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-উৎসব-শিকার-যুদ্ধ-ভৌতিক ব্যাপার-সম্মোহন) সমবেত হয়ে নাচ-গান করত। ধীরে ধীরে চাষাবাদ, পূজা, নানা আদিম সংস্কারবদ্ধ কাজের সঙ্গে নৃত্যগীতের সঙ্গে বাদ্যও জড়িত হতে থাকে। যে সময় থেকে এবং জীবনের যে ঐতিহ্য থেকে ভারতীয় সংগীতের প্রাচীনতম নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায় তাকে অনেকে ঋগ্‌বেদের সভ্যতা থেকে পূর্ববর্তী সভ্যতা-শিল্প-সংস্কৃতির ফসল মনে করেন।'[৮]

মহেঞ্জোদারো শব্দের অর্থ 'মড়ার ঢিপি'। সিন্ধুপ্রদেশের সিন্ধুনদের অববাহিকাস্থিত লাড়কানা জেলার অধিবাসীগণ এই ধ্বংসপ্রাপ্ত উঁচু টিলাটিকে (মহেঞ্জোদারো) মড়ার ঢিপি বলে অভিহিত করত। অপর পক্ষে হরপ্পা, মন্টগোমারি জেলায় তথা চানহুদরো, সুৎকাজেনদোর, ভাওয়ালপুর ইত্যাদি ধ্বংসপ্রাপ্ত ঐতিহ্যপূর্ণ সুপ্রাচীন নগরীসমূহ ভারতীয় সভ্যতার এক মর্মস্পর্শী ইতিহাস। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা ঝুকর, চানহুদরো ইত্যাদি সিন্ধু উপত্যকার প্রত্নতত্ত্বীয় শহরগুলোতে যে সকল নিদর্শন পাওয়া গেছে তার বহু ঐতিহাসিক উপাদানের মধ্যে সংগীতের বেশকিছু সামগ্রী প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে মূল্যবান। খোদাই করা তন্ত্রবাদ্য, অবনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র, ব্রোঞ্জ-নির্মিত নৃত্যরতা ভাস্কর্য তৎকালীন সংগীতের প্রকৃষ্ট পরিচয় বহন করে। ধ্বংসস্তূপ থকে প্রাপ্ত একটি মূর্তি-কণ্ঠে মৃদঙ্গ-জাতীয় অবনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র ঝুলতে দেখা যায়।

তাছাড়া দুটি সীলমোহরে আধুনিক মৃদঙ্গের ন্যায় বাদ্যযন্ত্র পরিলক্ষিত হয়, যার উভয় পাশ চর্মাচ্ছাদিত বলে অনুমান করা হয়। হরপ্পায় প্রাপ্ত একটি সীলমোহরে নৃত্যরতা নারীমূর্তি ও পুরুষকণ্ঠে ঝুলন্ত মৃদঙ্গ পাওয়া গেছে। অপর একটি সীলমোহরে মৃদঙ্গ বাদকের তালে তালে সবাইকে নৃত্য করতে দেখা যায়। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা ইত্যাদি স্থান হতে প্রাপ্ত ভাস্কর্য তথা অঙ্কিত নানা বিষয়বস্তু হতে আমাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, তখনকার সংগীতজীবনে নৃত্য, চামড়া-আচ্ছাদিত মৃদঙ্গ জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল। ঐতিহাসিক স্টুয়ার্ট পিগট প্রণীত *Pre History India* নামক গ্রন্থে সংগীতবিষয়ক মূল্যবান মন্তব্য এ রকম— Cymblos were used to accompany dancing, and in addition to this and the drum these were need , flutes or pipes, a stringed instrument of the lute class, and a harp or lyre, which is mentioned as having seven tones or notes. [page 270] এ ছাড়া রায়বাহদুর দীক্ষিত রচিত *Pre-historic civilization of the Indus Valley* গ্রন্থে সেসময়কার সংগীতধারাসমূহের স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, 'এটা' বেশ বুঝতে পারা যায় যে, নাচ-গান ছাড়াও সে যুগে (সিন্ধু সভ্যতার যুগে) কণ্ঠসংগীতের অনুশীলন হতো। তন্ত্রীযুক্ত বীণা প্রভৃতি এবং চামড়ার তৈরী মৃদঙ্গ-জাতীয় বাদ্যযন্ত্র তো ছিলই; গান ও নৃত্যের সঙ্গে তাল ও লয় রক্ষা করত ঐ বাদ্যযন্ত্রগুলি।[৯]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ হতে প্রাপ্ত দৈনন্দিন জীবনের বহু উপকরণ থেকে সে সময়কার সংগীত, সমাজব্যবস্থা, এবং জীবন-যাপনের একটি নিখুঁত ছবি ফুটে ওঠে।

৪. বৈদিক যুগে মৃদঙ্গ

বৈদিক যুগ বলতে আমরা ঋগ্বৈদিক যুগ বুঝি, কেননা ঋগ্বেদসাহিত্যের রচনাকাল থেকে ভারতীয় ইতিহাসের সৃষ্টি ধরা হয়। তবে বর্তমান ইতিহাসের বয়স নির্ণয় করা হয় বুদ্ধদেবের জন্মের আবির্ভাব কাল থেকে। কিন্তু ঋগ্বৈদিক যুগের সময়সীমা নির্ধারণ করা সহজ নয়। তবে বেদের সময় পর্ব নিয়ে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয় , যথা— খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০-১০০০ (মোক্ষমূলর), ২৫০০-১০০০ (উইন্টারনিট্স্), ৫০০০-৩০০০ (স্যার জন মার্শাল), ব্রাহ্মণ-২৫০০ (বালগঙ্গাধর তিলক) ইত্যাদি। সাংগীতিক এবং অন্যান্য বিচারে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের অনুমান, এই সময়সীমা খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ থেকে ৬০০০। এ মতটি আদিম, প্রাগৈতিহাসিক এবং বিভিন্ন দেশের সাংগীতিক ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর্যদের সভ্যতা বিস্তারের সাথে সাথে যে সাহিত্য ভারতের মাটিতে উদ্ভূত হয়েছিল, তা বৈদিক সাহিত্য নামে পরিচিত। এই সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগবেদ।[১০]

অপর এক ব্যাখ্যায় বৈদিক যুগের জন্মকাল হিসাবে খ্রিষ্টপূর্ব চার বা সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে ভারতবর্ষে যে নবসভ্যতা এবং সংস্কৃতির এক বিরাট মহাযজ্ঞের হোমশিখা জ্বলে উঠেছিল, তাকে প্রাজ্ঞগণ 'বৈদিক যুগ' নামে অভিহিত করেছেন। ঐতিহাসিকগণ খ্রিষ্টপূর্ব সাড়ে তিন হাজার বছর হতে খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ বছর সময়কে বৈদিক যুগ হিসাবে অভিহিত করেছেন। বৈদিক যুগীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং সামাজিক ক্রিয়াকর্ম ও আনন্দানুষ্ঠানের যে চিত্র ফুটে ওঠে তা হতে আমাদের সুস্পষ্টরূপে মনে হয় যে, সে-সময়ে সংগীতের তিনটি ধারা (গীত, বাদ্য, নৃত্য) প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল। সেই সময়ে যজ্ঞ তথা পূজা, হোম, ইত্যাদি অনুষ্ঠানে পুরনারীদের করতালি সহযোগে নৃত্যকালে তাদের সাথে সহযোগী বাদ্যযন্ত্র হিসাবে মৃদঙ্গ বাজানো হতো। তাছাড়া চর্মাচ্ছাদিত দুন্দুভি, ভূমি-দুন্দুভি, তথা মুতিঙ্গা নামক অবনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা মৃদঙ্গের তথা আধুনিক পাখোয়াজের অনুরূপ বলে মনে হয়। আদিম যুগে দুই প্রকার এক মুখযুক্ত অবনদ্ধ বাদ্য দেখতে পাই যেটি ছিল কাঠের এবং পোড়া মাটির তৈরী। এই দুই প্রকার অবনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রকে বৈদিক যুগে বলা হতো দুন্দুভি। দুন্দুভির কয়েকটি ভেদ থাকলেও সর্বদাই তা ছিল এক মুখযুক্ত চামড়ায় আচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র। বেদে তিন প্রকার দুন্দুভির উল্লেখ আছে— ভূমি-দুন্দুভি, দেব-দুন্দুভি, এবং বনস্পতি। ভূমি-দুন্দুভির অবয়ব ছিল পোড়া মাটির। আর বনস্পতির ছিল কাঠের তৈরী অবয়ব। দেব-দুন্দুভি সামগানে ছন্দ রক্ষার জন্য ব্যবহৃত হতো। দুন্দুভি যুদ্ধে, বিপদে ও নানা রকম উদ্দেশ্যে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ব্যবহৃত হতো। পরবর্তীকালে ভারতীয় অবনদ্ধ বাদ্যের যে বিবর্তন লক্ষ করা যায় তা ঐ মৃৎ-অঙ্গের বা মাটির তৈরী ভূমি-দুন্দুভি এবং কাষ্ঠাঙ্গের বনস্পতির ক্রমবিবর্তন ছাড়া আর কিছু নয়।

বৈদিক যুগের অবনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রগুলির আকৃতি চিত্র সহকারে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

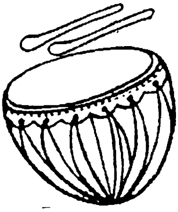
বৈদিক-দুন্দুভি

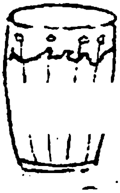
বনস্পতি

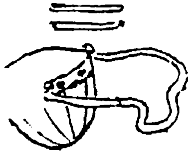
দেব-দুন্দুভি

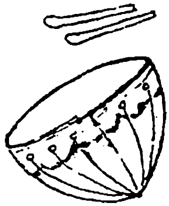
ভূমি-দুন্দুভি

বৈদিক যুগের অবনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে প্রধান ছিল 'দুন্দুভি' (আধুনিক 'নাকাড়া' বাদ্য)। এটি ছিল একমুখী, অর্ধ গোলাকৃতিবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। এর গঠন ছিল অনেকটা বৃহদাকৃতিবিশিষ্ট আধুনিক 'বাঁয়ার' মতো দু-হাত বা দুটি বেতের লাঠি দিয়ে একে বাজানো হতো। বেদ গ্রন্থ থেকে আমরা দুন্দুভি বাদ্যের দু-এক প্রকার ভেদের কথা জানতে পারি, যেমন— দেব-দুন্দুভি, ভূমি-দুন্দুভি, বনস্পতি ইত্যাদি। দেব-দুন্দুভি সম্ভবত আকৃতিতে ছিল ছোট, যা একটু বড় আকারের তাসার মতো দেখতে এবং কাঁধে ঝুলিয়ে বেতের তৈরী বা কাঠের তৈরী দুটি লাঠি দিয়ে বাজানো হতো। ভূমি দুন্দুভি মাটিতে রেখে দুটি-হাত বা লাঠি দিয়ে বাজানো হতো এবং এর আকৃতিও ছিল অনেক বড়। দুন্দুভির তৃতীয় প্রকার হচ্ছে 'বনস্পতি' বড় গাছের মোটা গুঁড়ি কেটে ভিতরটাকে ফাঁপা করে চামড়ার আচ্ছাদন করা থাকত। কাষ্ঠ-নির্মিত দুন্দুভি বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল। বৈদিক যুগে অন্যান্য চর্মবাদ্যের মধ্যে আদম্বর (বা আড়ম্বর) নামক বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা আকৃতিতে মৃদঙ্গ বা আধুনিক পাখোয়াজের মতো দেখতে।

বৈদিক যুগে সংগীত ছিল যাগযজ্ঞের অঙ্গীভূত। তখন আরণ্যক-সংহিতা পূর্বার্চিক, উত্তরার্চিক, গ্রামগেয়গান, অরণ্যগেয়গান, ঊহ, ঊহ্য, স্তোভ, স্তোম ইত্যাদি ছিল সংগীতের রূপ। সেই সংগীত ছিল বৈদিক গান বা সামগান। যজ্ঞবেদীর পাশে ঋত্বিক ও সামগ-ব্রাহ্মণেরা স্বরে, ছন্দে ও কখনো কখনো উপরিউক্ত বাদ্যযন্ত্রের তথা মৃদঙ্গ সহযোগে সামগান করতেন। তাছাড়া সামগানের সাথে ভূমি-দুন্দুভিতে তাল দেওয়ার রীতি ও প্রচলন ছিল। পরবর্তীকালে নতুন নতুন আরো অনেক বাদ্যযন্ত্রের নাম সংযোজিত হলো অবনদ্ধ যন্ত্র হিসাবে। এর মধ্যে ভেরী, ঘট, ডিমডিম, পুষ্কর, পটহ, মুরজ, সম্বল, দুর্দর ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সুতরাং আধুনিককালে প্রচলিত তন্ত্র, (তারের) সুষির, অবনদ্ধ তথা ঘনবাদ্যের প্রচলন পূর্বসূরিদের অনুসৃত হলেও আকার, প্রকার তথা বাদনশৈলী বিবর্তনক্রমে নবরূপায়ণের সাক্ষ্য বহন করে। এটি বৈদিক তথা পৌরাণিক যুগের অনুসৃত পথ পার হয়ে বর্তমান স্বরূপে প্রকাশিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

৫. বেদোত্তর প্রাচীন মৃদঙ্গ

বৈদিক যুগ অতিক্রম করে সংগীতধারা ও বিভিন্ন শিল্প ক্রমশ পরিশীলিত এবং উন্নত হয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিস্তার লাভ করে। এ সময় আর্যগণ তাদের বিভিন্ন প্রয়োজনে

ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং রাজন্যকুল তথা বিভিন্ন জনপদের প্রসার ঘটে। 'বেদোত্তর' যুগ বলতে খ্রি. পূ. ১৫ শতক থেকে খ্রিষ্টীয় ১২ শতক পর্যন্ত কালকে বোঝায়। এ যুগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত পৌরাণিক যুগ, ব্রাহ্মণ্য হিন্দু যুগ বা গুপ্ত যুগ, পাল যুগ, এবং সেন যুগ। এরপর ভারতবর্ষের ইতিহাসে শুরু হয় মধ্যযুগ। 'বেদোত্তর' যুগকে আধুনিক কালে কোনো কোনো গবেষক লৌকিক যুগ বলে আখ্যায়িত করেন। কারণ এই যুগে বৈদিক 'সদাচার'-এর পরিবর্তে লৌকিক আচার প্রাধান্য পায়। ঋষি-নিয়ন্ত্রিত বৈদিক সমাজের পরিবর্তে লৌকিক স্মার্ত-ব্রাহ্মণশাসিত নতুন সমাজ সৃষ্টি হয়। এই সমাজে মূর্তিপূজা, মন্দিরকেন্দ্রিক শহর ও সভ্যতা, বৈদিক গুণগত, কর্মভিত্তিক বর্ণাশ্রমের পরিবর্তে জাতিভেদ-প্রথা ও 'জাত্যাশ্রম' এবং পদবীর ব্যবহার প্রচলিত হয়। এই যুগেই লৌকিক অবনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রগুলি বিশেষভাবে বিকশিত হয়। যেমন— মৃদঙ্গ, মুরজ পটহ, পুষ্কর, পণব, দুর্দর, ঝর্ঝর ইত্যাদি। বেদোত্তর যুগের প্রাচীন অবনদ্ধ বাদ্য তথা মৃদঙ্গ বা আধুনিক কালের পাখোয়াজ সম্পর্কে জানতে হলে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাব প্রাচীন সংগীতশাস্ত্র-গ্রন্থগুলিতে। এর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম গ্রন্থগুলি হচ্ছে ভরতমুনি রচিত *নাট্যশাস্ত্র*, শার্ঙ্গদেব রচিত *সংগীত-রত্নাকর*, নান্যদেব রচিত *ভরত-ভাষ্যম্* প্রভৃতি।

নিম্নে ভরতমুনি রচিত *নাট্যশাস্ত্রে* এবং শার্ঙ্গদেব রচিত *সংগীত-রত্নাকরে* মৃদঙ্গ সম্পর্কে যে বিবরণ আছে তা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হলো।

ক. *নাট্যশাস্ত্রে* মৃদঙ্গ

খ্রিষ্টপূর্ব আনুমানিক দ্বিতীয় শতকের গোড়ার দিকে নাট্যানুষ্ঠানে সংগীতের (গীত, বাদ্য, নৃত্য) যে ব্যবহার করা হতো তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থে। ভরতের *নাট্যশাস্ত্রে* আলোচনার মূল বিষয় হলো নাট্যবিজ্ঞান। নাটকের অঙ্গ হিসাবে সংগীতের ত্রিধারা সম্পর্কে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। *নাট্যশাস্ত্রে* ২৮ থেকে ৩৩ অধ্যায়ে বিশেষভাবে নাট-সংগীত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সে যুগে গীত, বাদ্য, নৃত্য কীভাবে নাটকে ব্যবহার করা হতো এবং সেই সংগীতের রূপের বিস্তৃত পরিচয় ভরত দিয়েছেন।

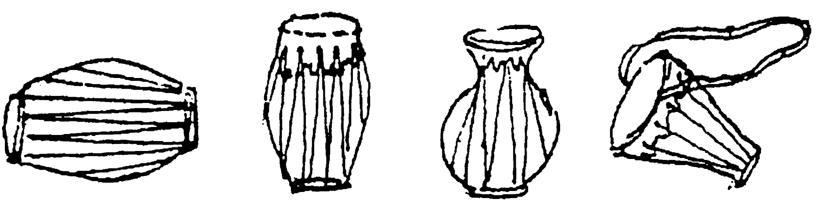

আঙ্কিক-মৃদঙ্গ উর্ধ্বক-মৃদঙ্গ দুর্দর-মৃদঙ্গ আলিঙ্গ্য-মৃদঙ্গ

ভরতের *নাট্যশাস্ত্রের* সৃষ্টিকাল সম্পর্কে কয়েকটি মত

আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থশতকে পাণিনির লিখিত ব্যাকরণে নটসূত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। ভরতের *নাট্যশাস্ত্রের* নটসূত্র ভিন্ন। কালের বিচারে সহজে অনুমান করা যায় যে, *নাট্যশাস্ত্র* পাণিনির আগের গ্রন্থ।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*কে খ্রিষ্টপূর্ব যুগের গ্রন্থ বলে অভিমত দিয়েছেন।
ড. পি.ভি. কেন তাত্ত্বিক যুক্তির মাধ্যমে বলেছেন যে, *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থটি খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বেই সৃষ্ট।
পতঞ্জলি তাঁর গ্রন্থে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সেসব বিবেচনা করে তিনি বলেছেন, *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থটি কোনো অবস্থাতেই তিনশ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের পরে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। কারণ পতঞ্জলি তাঁর গ্রন্থ লিখেছেন আনুমানিক দ্বিতীয় শতকে।
অর্থশাস্ত্রবিদ কৌটিল্যের কালপর্ব খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বভাগে। তাই তিনি যুক্তি দিয়েছেন, ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* এর পূর্বেকার বা সমকালীন গ্রন্থ।
ড. রাঘবন ভরতের কাল নির্দিষ্ট করেছেন দ্বিতীয় খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। ড. কৃষ্ণমাচারিয়ার, ড. ভাণ্ডারকর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী *নাট্যশাস্ত্র* রচনার কাল নির্দেশ করেছেন খ্রি. পূ. থেকে দ্বিতীয় শতাব্দী।
ড. মনমোহন বসুও *নাট্যশাস্ত্রের* প্রকাশকাল খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী বলেছেন।
নন্দিকেশ্বর রচিত *অভিনয়দর্পণ* গ্রন্থটির সৃষ্টিকাল খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী। গ্রন্থকার ভরতকে খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর আগেকার আচার্য বলে স্বীকার করেছেন।[১১]

অবনদ্ধ বাদ্য সম্পর্কে ভরত তাঁর *নাট্যশাস্ত্রের* ৩৩ অধ্যায়ে অর্থাৎ অবনদ্ধাতোদ্যবিধানাধ্যায় (অবনদ্ধ + আতোদ্য + বিধান + অধ্যায়)-এ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। *নাট্যশাস্ত্রে*ও অবনদ্ধ বাদ্যের তথা মৃদঙ্গের আলোচনায় তিনজন প্রাচীন সংগীতজ্ঞানীর নাম পাই। তাঁরা হলেন : স্বাতিমুনি, নারদমুনি ও বিশ্বকর্মা। এঁদের মধ্যে প্রথম দুই জন ছিলেন সংগীত-তাত্ত্বিক এবং শেষোক্তজন ছিলেন বাদ্যযন্ত্র নির্মাতা। আসলে বৈদিক যুগের মধ্যভাগ থেকেই শ্রমিক-সম্প্রদায়, পূতকার শ্রমিক সম্প্রদায়কে 'বিশ্বকর্মা' পরম্পরা বলা হতো। স্বাতিমুনি ছিলেন অবনদ্ধ বাদ্য সম্পর্কে একজন মহাজ্ঞানী এবং প্রবক্তা-পুরুষ। অপরদিকে 'নারদ' সম্প্রদায় যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র (বিশেষভাবে বীণা-জাতীয় বাদ্য) এবং 'রাগ' সম্পর্কে প্রাচীন জ্ঞানধারী।

ভরত বলেছেন, স্বাতিমুনি সর্বপ্রথম পুষ্করবাদ্য সৃষ্টি করেন (৩৩/৮)। বৈদিক যুগের অন্তভাগে যাবতীয় গান্ধর্বসংগীত প্রযোজ্য আনদ্ধ বাদ্যকে 'পুষ্করবাদ্য' বলার রীতি ছিল। তার আগে বৈদিক এক মুখযুক্ত আনদ্ধবাদ্য 'দুন্দুভি' প্রচলিত ছিল। যাই হোক *নাট্যশাস্ত্রে* বর্ণিত উপাখ্যানটি এ রকম (৩৩/৫-১১)— "কোন এক অনধ্যায় দিবসে (অর্থাৎ ছুটির দিনে) স্বাতিমুনি নিকটবর্তী এক পুষ্করিণী থেকে জল আনতে গিয়েছিলেন। সে দিন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ছিল। হঠাৎ আকাশ ভেঙে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। অবশ্য এই মুষলধারার পশ্চাতে কারণ হল, দেবরাজ ইন্দ্র পৃথিবীতে একটি বড় জলাশয় নির্মাণ করতে চান। যাই হোক, ছোট, বড় ও মধ্যম আকারের বৃষ্টিফোঁটা ঐ পুষ্করিণীতে স্থিত অসংখ্য পদ্মপত্রের উপর পড়তে লাগল। ফলে, বৃষ্টিপাতের তিন প্রকার মধুর ধ্বনি শ্রবণ করে স্বাতিমুনি উদ্বুদ্ধ হয়ে আশ্রমে ফিরে এমন একটি অবনদ্ধ বাদ্য নির্মাণের পরিকল্পনা করতে লাগলেন, যাতে অল্প, মাঝারি ও প্রবল ধ্বনিবিশিষ্ট নাদ প্রকাশ করা যায়। এজন্য তিনি দেবপূতকার বিশ্বকর্মার সহায়তায় পুষ্কর বাদ্যের তিনটি রূপ সৃষ্টি করলেন, যথা— মৃদঙ্গ, দুর্দর ও পণব। সৃষ্টি করলেন দেবগণের (অর্থাৎ বৈদিকদের) দুন্দুভিকে পর্যবেক্ষণ করে মুরজ, আলিঙ্গ্য, ঊর্ধ্বক ও আঙ্কিক প্রভৃতি বাদ্য। আসলে 'মুরজ' শব্দ 'মৃদঙ্গ' শব্দের

সমার্থক। মৃদঙ্গের বহু ভেদকে বিশ্বকর্মা তিন প্রকার রূপভেদে বিভক্ত করেছিলেন, যথা— ক. ফিতে দিয়ে গলায় ঝুলানো 'আলিঙ্গ্য', খ. গলায় না ঝুলিয়ে বঙ্গো, কঙ্গো প্রভৃতি ঊর্ধ্বমুখী বাদ্যের মতন 'ঊর্ধ্বক', এবং গ. কোলে রেখে ঢোল জাতীয় বাদ্যের ন্যায় 'আঙ্কিক'।"[১২]

ভরত লিখেছেন, স্বাতিমুনি মৃদঙ্গ, দুর্দর ও পণব বাদ্যকে চামড়া দিয়ে ঢেকে, চামড়ার টান ঠিক রাখার জন্য অন্ত্রজ (জন্তুর নাড়ী থেকে উৎপন্ন) তন্ত্রীর ছোট্ সংযুক্ত করেছিলেন। এরপর স্বাতিমুনি ঝল্লরী, পটহ প্রভৃতি বাদ্য সৃষ্টি করে তাদেরও মুখগুলি চামড়া দিয়ে ঢেকে, তন্ত্রীর 'ছোট্' সংযুক্ত করেছিলেন। তৎকালীন নাট্যে প্রযুক্ত অবনদ্ধ বাদ্যগুলিকে প্রয়োগ প্রাধান্য অনুসারে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল, যথা— ১) অঙ্গবাদ্য বা প্রধানবাদ্য, এবং ২) প্রত্যঙ্গবাদ্য বা অপ্রধান বা সহকারী বাদ্য। ভরতমুনি মৃদঙ্গ, দুর্দর ও পণব বাদ্যকে 'অঙ্গবাদ্য' এবং ঝল্লরী, পটহ প্রভৃতি বাদ্যকে 'প্রত্যঙ্গ বাদ্য' বলেছেন। আসলে প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে বৃন্দবাদনের ব্যাপারে বাদ্যসমূহের প্রয়োগ প্রাধান্য ভেদ অনুসারে 'অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ' শ্রেণিকরণ করা হয়েছিল বলে মনে হয়। অঙ্গবাদ্যকে সে যুগে 'পুষ্করবাদ্য' বলা হতো, এ জন্য ভরত 'ত্রি-পুষ্কর' বলতে মৃদঙ্গ , দুর্দর ও পণব বাদ্যের উল্লেখ করেছেন। সে সময় প্রচলিত অবনদ্ধ বাদ্যসমূহের প্রয়োগ ব্যাপারে *নাট্যশাস্ত্র*কার ভরত বলেছেন যে, উৎসবে, রাজকীয় শোভাযাত্রায়, মঙ্গলকারক কর্মে, শুভযোগে, বিবাহকর্মে, সন্তান জন্মে, যুদ্ধকালে প্রভৃতিতে অবনদ্ধ বাদ্য বাজানো হয়। এছাড়াও ছোট ছোট ঘরোয়া অনুষ্ঠানে (যেখানে অল্প সংখ্যক লোকের সমাবেশ ঘটে) ভাণ্ড বাদ্য বাজানো হয় বলে তিনি জানিয়েছেন। ভরত তাঁর *নাট্যশাস্ত্রে* মৃদঙ্গ, পণব বাদ্যের আকৃতি ও পরিমাপ বর্ণনা করেছেন। প্রথমে 'মৃদঙ্গ' বাদ্যের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, মৃদঙ্গেরও রূপ তিন প্রকার যথা— ক) হরিতকি আকৃতির খ) যব আকৃতির এবং গ) গোপুচ্ছ (গোরুর লেজ) আকৃতির। আগেই জানানো হয়েছে যে, মৃদঙ্গের তিন প্রকার ভেদ ছিল, যথা— আঙ্কিক, ঊর্ধ্বক এবং আলিঙ্গ্য। ভরত জানিয়েছেন, আঙ্কিক মৃদঙ্গ (কোলে রেখে বাজানো হতো) হরিতকি আকৃতির, ঊর্ধ্বক মৃদঙ্গ (অর্থাৎ বঙ্গো, কঙ্গো বাদ্যের অনুরূপ) ছিল যব আকৃতির, এবং আলিঙ্গ্য মৃদঙ্গ (অর্থাৎ কাঁধে ঝুলিয়ে বাজানো হতো) ছিল গোপুচ্ছ আকৃতির অর্থাৎ গরুর লেজের মতন নিম্নদেশ শীর্ণ।

মৃত্তিকা নির্মিত বা পোড়া মাটির তৈরী বলে উপরিউক্ত সব কয়টি আনদ্ধ বাদ্যকেই ভরত 'মৃদঙ্গ' বলেছেন। কিন্তু 'ঊর্ধ্বক' নামক একমুখী শেষ বাদ্যটি সম্ভবত কাষ্ঠ নির্মিত ছিল। আঙ্কিক মৃদঙ্গের দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন তাল (সাড়ে তিন বিঘৎ বা প্রায় সাড়ে ৩১ ইঞ্চি) এবং 'মুখ' (যেখানে চামড়ার আচ্ছাদন দেওয়া হয়) বারো অঙ্গুলি (প্রায় ৯ ইঞ্চি) পরিমাণ ব্যাস। *সঙ্গীত-রত্নাকর* গ্রন্থে বর্ণিত 'মার্গপটহ' এবং আধুনিক যুগের 'মহামৃদঙ্গ' বাদ্যেও পূর্ব পুরুষরূপে 'আঙ্কিক মৃদঙ্গ'কে কল্পনা করা সমীচীন বলে মনে হয় না। তাছাড়া, *নাট্যশাস্ত্রে* 'পটহ' বাদ্যকে 'প্রত্যঙ্গ' বা অপ্রধান বাদ্যরূপে উল্লেখ করলেও তার রূপ বর্ণনা করা হয়নি। ঊর্ধ্বক মৃদঙ্গেরও দৈর্ঘ্য চার তাল (২ হাত বা প্রায় ৩ ফুট) এবং এর 'মুখ' চৌদ্দ অঙ্গুলি (প্রায় সাড়ে দশ ইঞ্চি)। প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষে যে সব বাদ্যযন্ত্রের মূর্তি দেখা যায়, তাদের মধ্যে প্রায়শই বঙ্গো, কঙ্গো জাতীয় 'ঊর্ধ্বক মৃদঙ্গ' চোখে পড়ে। আলিঙ্গ্য

মৃদঙ্গের দৈর্ঘ্য তিন তাল (দেড় হাত বা ২ ফুট ৩ ইঞ্চি) এবং এই শ্রেণির বাদ্যের মুখ আট অঙ্গুলি (প্রায় ৬ ইঞ্চি)। *নাট্যশাস্ত্রে* অবনদ্ধ বাদ্যের আলোচনা অনেক সময় পাঠকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, বিশেষত পুষ্কর, মৃদঙ্গ, মুরজ, ত্রিপুষ্কর প্রভৃতি শব্দগুলি নানা অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য। তবে এটুকু বোঝা যায় যে, ভরতকালীন সর্বপ্রকার অবনদ্ধ বাদ্যকে পুষ্কর বাদ্য বলার রেওয়াজ ছিল (৩৩/২৪)। কারণ 'পুষ্কর' শব্দটি নাকি (পুঃ+কর)—এ ভাবেই উৎপত্তি হয়েছে, যার অর্থ 'চর্মাচ্ছাদিত'। *নাট্যশাস্ত্রে* আলোচিত অবনদ্ধ বাদ্যকে আমরা একটি তালিকার সাহায্যে ব্যক্ত করতে পারি।

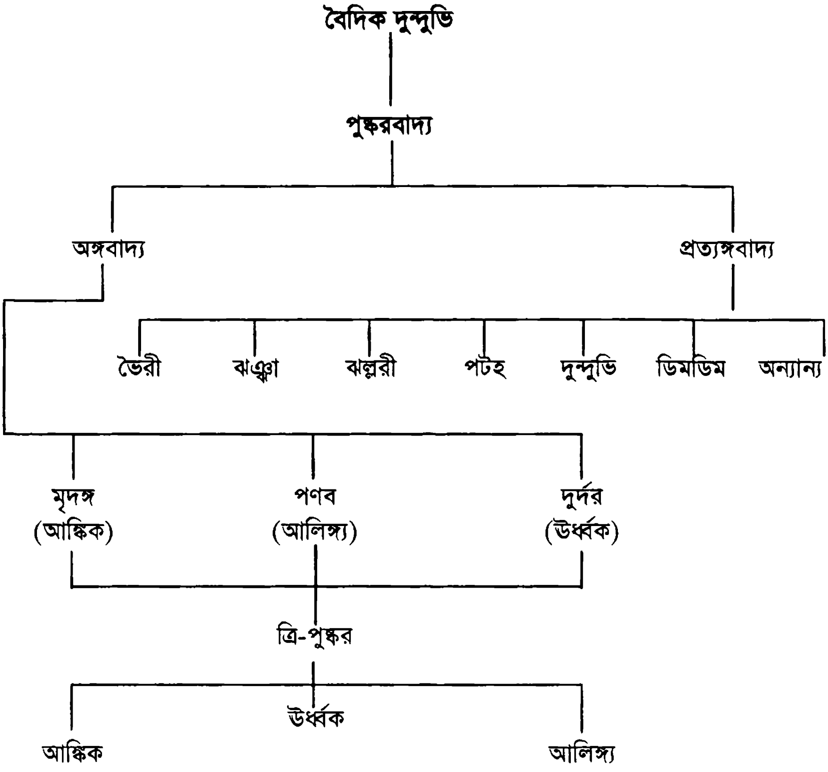

ভরতমুনি যা কিছু আলোচনা করেছেন তা সবই 'অঙ্গ বাদ্য' নিয়ে। তিনি বলেছেন, ভেরী, পটহ, ঝঞ্ঝা, ডিমডিম, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যের 'মার্জনা'র বা নিদিষ্ট সুরে যন্ত্র বাঁধার প্রয়োজন নেই। কারণ এই শ্রেণির বাদ্যগুলির ছোট্ বা চামড়ার ফিতেগুলির শিথিলীকরণ কিংবা দৃঢ়ীকরণ করে বাদ্যগুলির ধ্বনি গাম্ভীর্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো হয়ে থাকে। কিন্তু ত্রি-পুষ্করবাদ্যের ক্ষেত্রে বাদ্য মার্জনার প্রয়োজন আছে, কারণ এই শ্রেণির বাদ্যযন্ত্রগুলিতে নানা প্রকার প্রহর দ্বারা 'বোলবাণী' প্রকাশ করা হতো। *নাট্যশাস্ত্রে* মৃদঙ্গাদি অবনদ্ধ বাদ্যের

'মার্জনা' বা সুরে বাঁধার ব্যাপারে ভরত প্রাচীন তিন প্রকার রীতির কথা আলোচনা করেছেন। একে তিনি বলেছেন 'ত্রিমার্জনা'। যথা মায়ূরী, অর্ধমায়ূরী ও কার্মারবী। এই তিন প্রকার মার্জনা যথাক্রমে মধ্যমগ্রামীয় স্বরে এবং সাধারণ গান্ধার সমন্বিত স্বরে করা হতো। ভরত জানিয়েছেন, মায়ূরী মার্জনায় পুষ্কর বাদ্যের (অর্থাৎ আঙ্কিক মৃদঙ্গের বাম মুখ মধ্যম-গ্রামীয় 'গা'- স্বরে এবং ডান-মুখ মধ্যম গ্রামীয় 'সা'-স্বরে বাঁধা হবে। ঊর্ধ্বক-মৃদঙ্গের ক্ষেত্রে (এক-মুখ বিশিষ্ট বাদ্য) মধ্যমগ্রামীয় 'সা'-স্বরে এবং ডান মুখ ষড়জগ্রামীয় 'রি'-স্বরে বাঁধা হবে। ঊর্ধ্বক মৃদঙ্গের বেলায় (একটি মাত্র মুখ বলে) ষড়জগ্রামীয় 'ধা'-স্বরে বাঁধা হবে। কার্মারবী মার্জনায় পুষ্কর বাদ্যের (আঙ্কিক শ্রেণির) বাম মুখ সাধারণ গ্রামের 'রি'স্বরে এবং ডান মুখ ওই গ্রামেরই 'সা'-স্বরে বাঁধা হবে। ঊর্ধ্বক 'পা' স্বরে বাঁধা হবে। জাতি , রাগ এবং স্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত বাদ্য মার্জনায় এই যে স্বরগুলির (বিভিন্ন গ্রামে) কথা বলা হলো, এদেরই অনুবাদী 'নি'-স্বরে আলিঙ্গ্য-মৃদঙ্গের একটি মাত্র 'মুখ' বাঁধা হবে।

নাট্যশাস্ত্রে লিখিত ভরত-মুনির বক্তব্য নিম্নে একটি ছকের সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে :

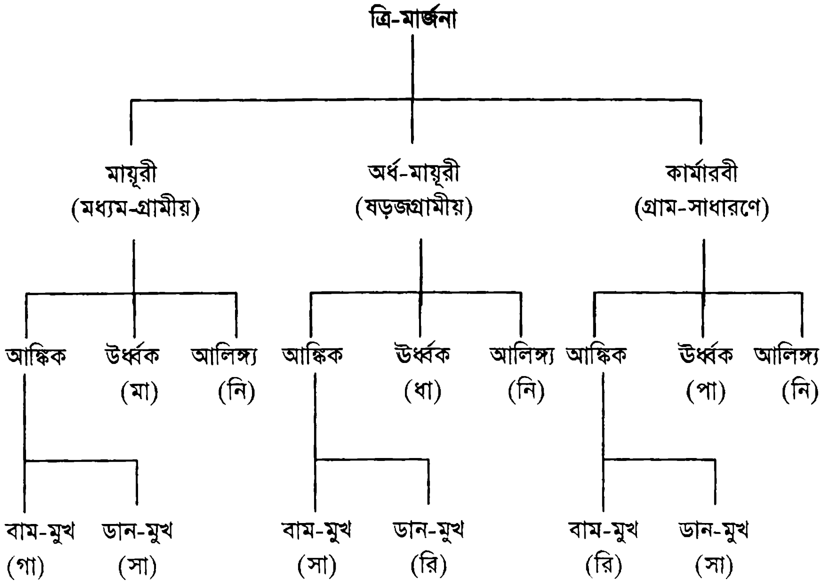

যাই হোক, পুষ্করবাদ্য-মার্জনার ব্যাপারে *নাট্যশাস্ত্রে* কোথাও লেখা নেই যে, বাদ্যযন্ত্রগুলিকে সুরে মেলানোর জন্য কাঠের গুলি বা 'গট্টা' অথবা লোহার রিং প্রভৃতি ব্যবহার করা হতো। আমাদের অনুমান, আধুনিক কালের শ্রীখোল বাদ্যের মতনই, নির্মাণকালে ডানমুখ কোনো একটি নির্দিষ্ট সুরে বেঁধে নেওয়া হতো এবং বাম মুখকে আটা বা মাটির প্রলেপের হেরফের ঘটিয়ে ঈপ্সিত স্বরে বাঁধা হতো বা মার্জনা করা হতো। *নাট্যশাস্ত্রে* ভরত মুনি বলেছেন, মৃদঙ্গের বাম মুখে এবং ঊর্ধ্বক শ্রেণির বাদ্যে (যেমন,

দুর্দর) নদী-তটবর্তী উত্তম কালো মাটির প্রলেপের হেরফের ঘটিয়ে মার্জনা ক্রিয়া করতে হবে। যেখানে উপযুক্ত মাটি পাওয়া যাবে না সেখানে আটার প্রলেপ দেওয়া যেতে পারে।

ভরত এও বলেছেন যে, আটার প্রলেপের একটা দোষ আছে। এতে একই প্রকৃতির ধ্বনি নির্গত হয়। তাই, মৃদঙ্গের বাম মুখে এবং ঊর্ধ্বকের মুখে আটার প্রলেপ অপেক্ষা কালো মাটির প্রলেপই সর্বোত্তম। *নাট্যশাস্ত্রের* যুগে মৃদঙ্গের ডান মুখে গাব লাগানো হতো কিনা পরিষ্কারভাবে বলা নেই। কিন্তু 'মার্জনা' বা বাদ্যের সুর-আলোচনায় ভরত মুনি মৃদঙ্গের বাম মুখে কালো মাটি অথবা আটার প্রলেপের কথা বলেছেন। আবার মৃদঙ্গে রোহণ-লেপন আলোচনায় জানিয়েছেন গাওয়া ঘি, তেল ও তিলচূর্ণের মিশ্রণে যে, কালো মণ্ড তৈরী হয় (তিল আছে বলেই) ডানমুখে ঐ মণ্ডের প্রলেপ হবে কিনা, সে কথা অবশ্যই বলা নেই। আমাদের ধারণা, ঐ প্রলেপ পাতলা করে মৃদঙ্গের ডান-মুখেই দেওয়া হতো। এই হচ্ছে *নাট্যশাস্ত্রে* বর্ণিত মৃদঙ্গ বাদ্যের কথা। যার থেকে আমরা আঙ্কিক-মৃদঙ্গের আলোচনা গ্রহণ করে মৃদঙ্গের ক্রমবিবর্তনের আদি রূপটি উপলব্ধি করতে পারি।

খ. *সংগীত-রত্নাকরে* মৃদঙ্গ

শার্ঙ্গদেব লিখিত *সংগীত-রত্নাকর* গ্রন্থটি আনুমানিক ১২৩৫-৪০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি সংকলন-গ্রন্থ, যা শার্ঙ্গদেব তাঁর পূর্বাচার্যদের গ্রন্থরাজি থেকে সংকলন করেছিলেন। গ্রন্থটির বাদ্যাধ্যায়ে শার্ঙ্গদেব বহুপ্রকার অবনদ্ধ বাদ্যের মধ্যে কেবল ২৩টির আলোচনা করেছেন। এগুলি হলো— মার্গ পটহ, দেশী পটহ, মর্দল, হুডুক্কা করটা, ঘট, ঘড়স, ঢবস, ঢক্কা, কুডুবা, রুঞ্জা, ডমরু, ডক্কা, মণ্ডিডক্কা, ডক্কুলি, সেলুক্কা, ঝল্লরী, বাণ, ত্রিবলী, দুন্দুভি, ভেরী, নিঃসাণ ও তুম্বকী। প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রীয় অবনদ্ধ-বাদনকে বুঝতে হলে *সংগীত-রত্নাকর*-এর মতন গ্রন্থ আর একটিও নেই। *নাট্যশাস্ত্র* রচয়িতা শুধু গান্ধর্ব বা মার্গ বাদ্য এবং বাদন নিয়ে আলোচনা করেছেন, অবনদ্ধ বাদ্যের ব্যাপারে একটিও কথা বলেননি। কিন্তু শার্ঙ্গদেব মার্গ-বাদ্য ও বাদনের কথা আলোচনা তো করেছেনই, উপরন্তু অভিজাত দেশীয় বা খ্রিষ্টোত্তর যুগের আঞ্চলিক ক্লাসিক্যাল অবনদ্ধ বাদ্য ও বাদনের কথাও বর্ণনা করেছেন। এর থেকে পরবর্তীকালে হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটক মৃদঙ্গ-বাদ্যের আকৃতি ও বাদনের বিবর্তনকেও অনুধাবন করা যায়।

যাই হোক, *সংগীত-রত্নাকর গ্রন্থে* শার্ঙ্গদেব বর্ণিত অবনদ্ধ বাদ্যের মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থসমূহ হলো :

ক. মার্গ-পটহ : খয়ের-কাঠের তৈরী এই বাদ্যযন্ত্রটির দৈর্ঘ্য আড়াই হাত অর্থাৎ প্রায় ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি, মধ্যাংশ স্থূল এবং তার পরিধি ৬০ অঙ্গুলি বা ৪৫ ইঞ্চি, অর্থাৎ ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি। বাদ্যটির ডানমুখের ব্যাস সাড়ে এগার অঙ্গুলি বা সাড়ে আট ইঞ্চির সামান্য বেশি। বাম মুখ সাড়ে দশ অঙ্গুলি প্রায় আট ইঞ্চি পরিমিত। ছয় মাসের মৃত বাছুরের পেটের চামড়া দিয়ে বাদ্যটির দুটি মুখ আচ্ছাদিত হবে। ডানমুখে লোহার পাতের বালা আটকানো থাকবে যা ডানমুখের চর্মাচ্ছাদনকে আটকে রাখবে। একইভাবে বাম-মুখের চর্মাচ্ছাদনকে আটকে

রাখবে পোড়ামাটি নির্মিত বালা। প্রত্যেকটি বালায় ৭টি করে ছিদ্র থাকবে। যাতে সরু সূতো দিয়ে ৭টি করে দুই মুখে মোট ১৪টি ছোট ছোট ধাতুতে নির্মিত ঘণ্টা ঝোলানো থাকবে। বাম-মুখ থেকে ৪ অঙ্গুলি (প্রায় ৩ ইঞ্চি) পরিমাণ ছেড়ে, ৩ অঙ্গুলি (প্রায় আড়াই ইঞ্চি) চওড়া লোহার পাত দিয়ে মার্গপটহকে শক্ত করে বেষ্টন করা হবে। বাদ্যের মুখ দুটিকে পশুচর্ম (কবল) দিয়ে আচ্ছাদিত করতে হবে। এই বাদ্য গলায় ঝুলিয়ে বাজাতে হয়। মার্গপটহ কোণ (লাঠি) অথবা হাত দিয়ে বাজানো হয়। বাদক পদ্মাসনে বসে কোলের ওপর বাদ্যটি রেখে বাজাবেন। বাদ্যটিতে 'গাব' ছিল না।

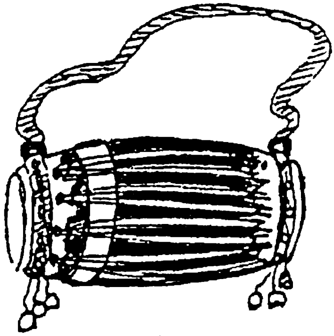

মার্গ পটহ

খ. দেশি-পটহ : 'মার্গ-পটহ'-এর মতই আকৃতি, তবে আকারে ছোট হয়। এর দৈর্ঘ্য দেড় হাত প্রায় (আড়াই ফুট), ডান মুখ ৭ অঙ্গুলি প্রায় সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি এবং বাম মুখ প্রায় পাঁচ ইঞ্চি। অর্থাৎ বাম মুখের তুলনায় ডানমুখ সামান্য বড়। পশুর পেটের নরম চামড়া (উদ্দলী) দিয়ে বাম মুখের ছাউনি দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, দেশি-পটহের ডান মুখ মার্গ-পটহের মতন 'কবল' বা পশুর দেহের শক্ত চামড়া দিয়ে আচ্ছাদন দেওয়া হয়। দেশি-পটহের উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদ আছে। 'উত্তম' দেশি-পটহে উপরিউক্ত লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। উত্তম পটহের যে মাপের কথা বলা হয়েছে তার $^{১}/_{১২}$ অংশ কম হলে 'মধ্যম' দেশি পটহ এবং $^{১}/_{৬}$ অংশ কম হলে 'অধম' দেশি পটহ হবে। এই পটহ-ও খয়ের কাঠের দ্বারা তৈরি করা হয় । সাধারণ লোক 'দেশি পটহকে' 'অড্ডাবজ' বলত। নাটকে ব্যবহার করার সময়ে 'মার্গ' বা 'দেশি' পটহকে মাটির ওপর খাড়া করে এক মুখে হাত বা লাঠি দিয়ে বাজানো হতো। এখানে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, শার্ঙ্গদেবের কালেই (১৩শ শতকের ১ম অর্ধ) ভারতীয় সংগীতে আওয়াজ শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

গ. মর্দল : 'মর্দল'-এর লক্ষণ বর্ণনায় শার্ঙ্গদেব বলেছেন, মর্দলেরই অপর নাম মৃদঙ্গ বা মুরজ। অর্থাৎ বাদ্যটি কাঠের তৈরী । এতে প্রমাণিত হয় যে, শার্ঙ্গদেবের সময়ের পূর্বেই কাষ্ঠ-নির্মিত অবনদ্ধ বাদ্যকেও 'মৃদঙ্গ' বলা হতো। আজ যেমন কাঠের তৈরী 'পাখোয়াজ' এবং দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত প্রধান অবনদ্ধ বাদ্য মৃদঙ্গম্‌কে মৃদঙ্গ বলা হচ্ছে। আবার মাটির তৈরী শ্রীখোলকে 'মৃদঙ্গ' বলার রীতি প্রচলিত আছে বৈষ্ণব সমাজে। অথচ

ভরতমুনির সময়ে মাটির তৈরী অবনদ্ধ বাদ্যকেই 'মৃদঙ্গ' বলা হতো। অনুমিত হয় যে, শাস্ত্রীয় অবনদ্ধ বাদ্যমাত্রই মধ্যযুগে 'মৃদঙ্গ' নামে পরিচিত হতো।

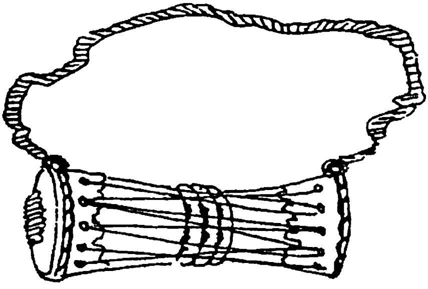

মর্দল

সংগীত-রত্নাকর গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'মর্দল' বাদ্যের মধ্যভাগ শীর্ণ (অনেকটা 'ডমরু'-বাদ্যের মতন) বাম মুখ ১৪ অঙ্গুলি (প্রায় ১০ $^{১}/_{২}$ ইঞ্চি) এবং ডান মুখ ১৩ অঙ্গুলি (প্রায় ৯ $^{৩}/_{৪}$ ইঞ্চি)। উভয় মুখে যে চামড়ার ছাউনি রয়েছে তাদের প্রত্যেকটিতে ৪০টি করে ছিদ্র আছে। যার মধ্যে দড়ির 'ছোট্' ঢুকিয়ে দুই মুখের চর্মাচ্ছাদন টানা দেওয়া হতো। বাদ্যটির মধ্যস্থলের সরু অংশটি দড়ির ছোট্-এর তিনটি পাক দিয়ে শক্ত করে বাঁধা থাকে। বাদ্যটির দুটি মুখের প্রান্তদেশে, বাদ্যদৈর্ঘ্যের প্রায় দ্বিগুণ লম্বা এবং প্রায় ৬ ইঞ্চি চওড়া সিল্কের ফিতে থাকে যার দ্বারা বাদ্যটি কাঁধে ঝুলিয়ে বাজানো হতো। বাম মুখে কাঠ-কয়লার ছাই ও ভাতমিশ্রিত মোটা 'গাব' এবং ডান মুখে পাতলা গাব দেওয়া হতো। বাদ্যের খোলটি অর্ধ অঙ্গুলি (প্রায় $^{৩}/_{৮}$ ইঞ্চি) পুরু। এই বাদ্য দু'হাত দিয়ে বাজানো হতো। *সংগীত-রত্নাকর* গ্রন্থে আর যে-সব অবনদ্ধ বাদ্যের কথা উল্লেখ আছে, মৃদঙ্গের ক্রমবিবর্তন আলোচনায় সেগুলির আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

৬. মধ্যযুগে পাখোয়াজ

বৈদিক যুগের পরবর্তীকাল থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিস্তৃত মধ্যযুগ হলো সংগীতের স্বর্ণযুগ। এই যুগে সংগীতের অভাবিত প্রসার, প্রচার ঘটেছিল। এ যুগে সংগীত-ভাণ্ডার সংগীত সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এ যুগে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন কালজয়ী সংগীতের দিকপালগণ। তাদের নতুন নতুন সৃষ্টিসম্ভারে সংগীত ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই যুগে জন্মগ্রহণ করেন শার্ঙ্গদেব, পার্শ্বদেব, লোচন, অহোবল, মতঙ্গ, কোহল, রামামাত্য, শ্রীনিবাস প্রমুখ প্রতিভাবান সংগীত গ্রন্থকার এবং আমীর খসরু, স্বামী হরিদাস, মিয়া তানসেন, নায়ক গোপাল, রাজা মানসিংহ তোমর, মীরা, কবীর, তুলসীদাস প্রমুখ বরেণ্য সংগীত সাধক।[১৩] মধ্যযুগের গ্রন্থগুলি বেশিরভাগ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলেও তার মধ্যে বেশ কিছু গ্রন্থ ফারসি ভাষায় লিখিত হয়। এর মধ্যে ফকীরউল্লাহ্ রচিত *রাগ-দর্পণ*, মির্জা খাঁ রচিত *তুহ্ফাতুল্-হিন্দ* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য, আবুল-ফজল লিখিত *আইন-ই আকবরী* গ্রন্থটি সংগীতের গ্রন্থ না হলেও এতে সংগীতের একটি অধ্যায় আছে যাতে

'পাখোয়াজ' আওয়াজ (বড় 'ডমরুর আকৃতি, গলায় ঝুলিয়ে দু'হাত দিয়ে বাজানো হয়), 'দুহুল' বা ঢোল (ছোট ঢোলের মতন, হাত ও লাঠি দিয়ে বাজানো হয়), 'অর্ধাওয়াজ' (ছোট আওয়াজ) প্রভৃতি অবনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা আছে। এদের মধ্যে 'পাখোয়াজ্' বাদ্যই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, কোনো একটি শব্দ বর্তমান রূপ পেতে অনেকগুলি স্তর পার হয়ে এসেছে। সেই হিসাবে 'পখ্' শব্দটি নিয়ে যদি চিন্তা করা যায় এবং কোনো না কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছানো সম্ভব। যেমন ধরা যাক 'পুষ্কর' (একটি বাদ্যযন্ত্র), এটিকে যদি আমরা ভাঙার চেষ্টা করি তাহলে তার একটি রূপ হতে পারে এরকম : পুষ্কর-পুখ্কর-পখ্খর- পখ্। অর্থাৎ 'পখ্, শব্দটি পুষ্করের অপভ্রংশ হতে পারে। কাজেই পুষ্কর (আবজ বাদ্যযন্ত্র) অপভ্রংশ হতে পারে, পুষ্কর এবং আবজ এই দুই বাদ্যযন্ত্রের সংমিশ্রণে নতুন বাদ্যযন্ত্র পখাবজ-এর উৎপত্তি হতে পারে। পাখোয়াজ বাদ্যযন্ত্রটির নাম বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়, যেমন : পাখওয়াজ, পাখাওয়াজ, পাখাবজ্ ইত্যাদি, অনেকে মনে করে 'পক্কা+আওয়াজ' থেকেই পাখওয়াজ নামটির সৃষ্টি হয়েছে। যুক্তিটি ইতিহাসসমর্থিত না হলেও নিতান্ত অবিশ্বাস্য নয়। প্রাচীন দারুজ মৃদঙ্গে কোনো গুটি ছিল না। সুর বসিয়ে শব্দ পরীক্ষা করে দেখা গেল আওয়াজ 'পাক্কা' তাই পাখোয়াজ। 'ধ্রুপদ' ধামার, সাদরা বা ধ্রুপদাঙ্গীয় গানে, নৃত্যে, বা বীণার সঙ্গে এ যন্ত্রটি বাজানো হয় ।

শার্ঙ্গদেবের *সংগীত-রত্নাকর* এবং জৈন সংগীতশাস্ত্রী বাচনাচার্যসুধাকলস লিখিত *সঙ্গীতোপনিষদ্সারোদ্ধার* (খ্রি. ১৫ শতকের মধ্যভাগ) গ্রন্থ দুটি পাঠ করলে বোঝা যায়, প্রাচীন-পটহ বাদ্যযন্ত্রের দুটি রূপ ছিল, যথা— পখওয়াজ ('পুষ্কর+আওয়াজ' বা সুধাকলস উল্লেখিত 'পখাউজ'), যা উত্তর ভারতে প্রচলিত ছিল এবং দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত 'অড্ডাবজ' (*সংগীত-রত্নাকর* গ্রন্থে উল্লেখিত) যা পরে মৃদঙ্গম্ নাম ধারণ করেছে। 'অড্ডাবজ' শব্দটি মনে হয় 'অর্দ্ধাওয়াজ' শব্দের অপভ্রংশ। কথিত আছে, আমির খসরু (১২৯৬-১৩১০) সেই যুগে মাটির তৈরি পাখোয়াজকে দুই ভাগ করে আমাদের বর্তমান বাঁয়া-তবলা সৃষ্টি করেছেন। আবুল ফজল রচিত *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থে (১৬ শতকের শেষভাগে) 'আওয়াজ' নামক এক স্বতন্ত্র বাদ্যের উল্লেখ আছে, যা দেখতে জোড়া লাগানো বাঁয়া-তবলার মতো, অর্থাৎ বৃহৎ আকারের 'ডমরু' বাদ্যের মতোই। *সংগীতরত্নাকর* গ্রন্থে 'হুডুক্কা' বাদ্যকে প্রচলিত ভাষায় 'আবজ' বলা হয়েছে। যেহেতু এটি কাঁধে ঝুলিয়ে বাজানো হতো। একে স্কন্ধাবজ-ও বলা হতো। আবুল ফজল কিন্তু পাখোয়াজ বাদ্যের আলাদা করে পরিচয় দিয়েছেন। 'পাখোয়াজ' ও 'মৃদঙ্গম্' কোলে রেখে বাজানো হয় (আঙ্কিক)। শার্ঙ্গদেব বলেছেন যে, তাঁর সময় মর্দল, মুরজ, ও মৃদঙ্গ একই জিনিস ছিল। এই বাদ্য গলায় ঝুলিয়ে বাজানো হতো বলে একে 'স্কন্ধাবজ (সুধাকলস বর্ণিত খন্দাউজ) বলা হতো। ১৫ শতকের অনেক আগে মর্দল, মুরজ, বা মৃদঙ্গ বাদ্যের দুটি রূপ দেখা যায়। একটি উত্তর ভারতে (বিশেষত পূর্ব ভারতে) প্রচলিত 'শ্রীখোল' বাদ্য। বৈষ্ণব সমাজে প্রাচীনকালে 'শ্রীখোল' বাদ্যকে 'মৃদঙ্গ' বলা হতো, তার প্রমাণ ১৬শ শতাব্দীর পূর্বে বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়টি দক্ষিণ ভারতে প্রাচীন 'মর্দল' বা 'মুরজ' বাদ্য 'মর্দলম'-এ রূপান্তরিত হয়। অবশ্য 'শ্রীখোল' ও 'মর্দলম্' বাদ্যের আকৃতিগত সামান্য পরিবর্তনও সাধিত হয়েছিল

পরবর্তীকালে। মধ্যযুগে সংগীতের তথা গীত, বাদ্য, নৃত্যের যে প্রচলন ছিল, তার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। সেই যুগে রাজা,বাদশা তথা বিশিষ্ট সংগীত গুণীরা ভারতীয় সংগীতের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে একটি নতুন রূপ দান করলেন। জীবনের সাথে সংগীত ওতপ্রোতভাবে মিশে গেল। জীবনচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংগীত এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করল। আর তাই সামগ্রিক বিচরে মধ্যযুগকে সংগীতের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা চলে।

৭. আধুনিক যুগে পাখোয়াজ

আধুনিক যুগে আক্ষরিক অর্থে 'মৃদঙ্গ' হলো শ্রীখোল ও মণিপুরী পুংবাদ্য। মৃত্তিকা তৈরী পাখোয়াজ, মৃদঙ্গম্, মর্দলম্ প্রভৃতি অবনদ্ধ বাদ্যযন্ত্রকে 'মৃদঙ্গ'রূপে অভিহিত করার রীতি শার্ঙ্গদেবের অনেক পূর্বকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। শাস্ত্রীয় সংগীতের জগতে 'মৃদঙ্গ' বলতে আধুনিক যুগের হিন্দুস্থানি 'পাখোয়াজ'কে বুঝায়। আধুনিক পাখোয়াজের জন্ম সম্পর্কে সংগীতের গবেষক ড. বিমল রায় বলেছেন, ভরতের লেখা যা ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে যদি সংশোধন করে পড়া হয় তাহলে দেখা যাবে, মৃদঙ্গ বৈদিক যুগের যন্ত্র না হলেও ভরতের জন্মের কিছুকাল পূর্বের যন্ত্র। তিনি আরো বলেছেন, স্বাতিমুনি মৃদঙ্গ ও পুষ্কর উভয়ই সৃষ্টি করেছিলেন। আবার তিনি বলেছেন, নাট্যশাস্ত্র ও পরবর্তী শ্লোকগুলি পড়লে বোঝা যায়, স্বাতিমুনির মৃদঙ্গ, পুষ্করের একটি সমার্থক শব্দ।[১৪]

বর্তমানে আধুনিক পাখোয়াজ ধ্রুপদ, ধামার, সাদ্‌রা এবং বিভিন্ন তার (তন্ত্র) যন্ত্রের সাথে, নৃত্যের সহযোগী বাদ্য হিসাবে বা একক (স্বতন্ত্র বাদন) হিসাবে বাজানো হয়ে থাকে। তার প্রমাণ আমরা পেয়ে থাকি বেনারসের ধ্রুপদ মেলার আয়োজন থেকে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধ্রুপদ, ধামার গানে এবং নজরুল ইসলামের ধ্রুপদ, ধামার গানে বর্তমানে পাখোয়াজের প্রচলন বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

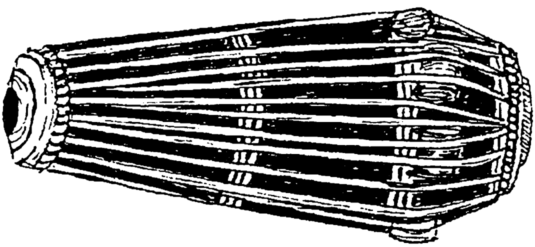

আধুনিক পাখোয়াজ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা একথা বলতে পারি যে, আদিম যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত পাখোয়াজ তথা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি 'মৃদঙ্গ' নামক বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে হয়েছে, যা সংগীতের ভাবনাকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। তবে একথা ঠিক যে, পাখোয়াজ বাদ্যযন্ত্র সৃষ্টি সম্পর্কে একটি পরিপুর্ণ ধারণা লাভের জন্য যেমন প্রয়োজন তথ্যের, তেমনি প্রয়োজন এর দীর্ঘ বিবর্তনকালের আর্থ-সামাজিক-ভৌগোলিক পরিবেশ সম্পর্কেও একটি পূর্ণায়ত ধারণার। কেননা স্থান-কাল-পাত্রের পটভূমিতেই এর বিবর্তনের ইতিহাসটি পূর্ণতা পেতে পারে।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. সুকুমার রায়, *ভারতীয় সঙ্গীত ইতিহাস ও পদ্ধতি*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ফার্মা কে.এল.এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ১৬
২. প্রদীপ কুমার ঘোষ, *শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিচয়* (১ম পর্ব), প্রথম প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত একাডেমী, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৭৬-৭৭
৩. তদেব, পৃ.৭৭
৪. অনিল ভট্টাচার্য, *তাল-সমীক্ষা*, প্রথম প্রকাশ, ছন্দশ্রী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২
৫. দেবব্রত দত্ত, *সঙ্গীত তত্ত্ব*, ২য় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, দেবী দত্ত, ১৯৯৭, পৃ. ৫
৬. শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, *মৃদঙ্গ-দর্পণ*, কলকাতা, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ।৵০
৭. দেবব্রত দত্ত, *সঙ্গীত তত্ত্ব*, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬
৮. সুকুমার রায়, *ভারতীয় সঙ্গীত ইতিহাস ও পদ্ধতি*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮
৯. দেবব্রত দত্ত, *সঙ্গীত তত্ত্ব*, ২য় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭
১০. উৎপলা গোস্বামী, *ধ্রুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ৪
১১. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *রাগ ও রূপ*, ৪র্থ সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ৬৬
১২. স্বপন ঘোষ, *মৃদঙ্গ পরিক্রমা*, এস.এম. পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১৩
১৩. মোবারক হোসেন খান, *বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গ*, প্রথম সংস্করণ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৫১
১৪. বিমল রায়, *পখাওজের জন্মকথা*, সুরছন্দা, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৬৯